অষ্টম অধ্যায়

'স্বর্ণযুগে' সামন্ততন্ত্রের সূচনা

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে উত্তর ভারতে কুষাণ আর দক্ষিণ ভারতে সাতবাহনদের শক্তি হ্রাসের ফলে যে রাজনৈতিক অনৈক্যের যুগ সূচিত হয় সেই যুগে কয়েকটি ক্ষুদ্র শক্তি ও নতুন রাজবংশের উত্থান ঘটে। এই পরিস্থিতিতে গুপ্তগণ একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাদের উৎপত্তি ও আদি বাসভূমি সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি। সম্ভবত পরবর্তী কুষাণদের একটি শাখার অধীনে আবির্ভূত হয়ে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের দ্বিতীয় দশকে তাঁরা মগধ অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। প্রথম দুজন গুপ্ত শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচ গুপ্ত তেমন গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন না। গুপ্ত রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কেবল শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের নামের উল্লেখ করেছেন। একজন লিচ্ছবি রাজকন্যাকে বিবাহ করে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মর্যাদা লাভের চেষ্টা করেছিলেন। তবে বৈশালী তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়নি। তাঁর রাজ্য ছিল মগধ এবং উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে (সাকেত ও প্রয়াগ) অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। তিনি *মহারাজাধিরাজ* উপাধি গ্রহণ করেন এবং আনুমানিক ৩১৯-২০ অব্দে তাঁর সিংহাসন আরোহণকাল থেকে গুপ্তাব্দ সূচিত হয়।

সম্ভবত খ্রিস্টীয় ৩২৫ অব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী রূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত। প্রতিদ্বন্দ্বী কাচকে দমন করে তাঁকে ক্ষমতা লাভ করতে হয়েছিল। সভাকবি হরিষেণ বিরচিত ও এলাহাবাদে একটি অশোকস্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ একটি দীর্ঘ প্রশস্তি থেকে তাঁর রাজ্যজয় সম্পর্কে জানা গেছে। মার্জিত সংস্কৃতে লিখিত এই প্রশস্তি, যা সম্রাটের মৃত্যুর পরেও লিখিত হতে পারে, সমুদ্রগুপ্তের বিজয় ঘোষণা করছে। এই প্রশস্তি থেকে জানা যায় তিনি অহিচ্ছত্রের অচ্যুত, পদ্মাবতীর (মধ্যপ্রদেশের পদ্মপাওয়া) নাগসেন, মথুরার গণপতিনাগকে উচ্ছেদ করেছিলেন। তিনি কোটা পরিবারের (বুলান্দশহর) এক রাজকুমারকেও বন্দি করেছিলেন। এর পরে হাজির করা হয়েছে তাঁর দ্বারা পরাজিত ও নানা ধরনের বশ্যতা স্বীকারকারী রাজা ও উপজাতির চমকপ্রদ তালিকা। বলা হয়েছে দক্ষিণাপথের বারোজন রাজাকেও তিনি বন্দি করেছিলেন, কিন্তু পরে তাঁদের মুক্ত করেন ও তাঁদের রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাছাড়া আর্যাবর্তের (উত্তর ভারত) আটজন রাজাকেও তিনি বলপূর্বক উন্মূলিত করেছিলেন এমন বলা হয়েছে। মধ্য ভারতের আরণ্যক রাজ্য (অটবি রাজ্য), পাঁচটি প্রত্যন্ত রাজ্যের শাসক এবং রাজস্থানের নয়টি উপজাতি রাজ্যের প্রধানগণ সমুদ্রগুপ্তকে কর দিতে ও তাঁর আজ্ঞা মান্য করতে বাধ্য হন। বৈদেশিক

Scanned with CamScanner

রাজগণ, যেমন 'দৈবপুত্র শাহানশাহী' ('স্বর্গপুত্র, রাজার রাজা', কুষাণদের অভিধাজ্ঞাপক), শক এবং শ্রীলঙ্কার শাসক তাঁকে বশ্যতাজ্ঞাপক কর দিতে রাজি হয়েছিলেন বলে এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সমুদ্রগুপ্তের শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেছিল এমন রাজ্যের তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ এবং তা ভারত উপমহাদেশের এক বৃহৎ অংশের নির্দেশক। কিন্তু সাধারণত মনে করা হয় সমুদ্রগুপ্ত কেবল উত্তর ভারতের ওপর প্রত্যক্ষ শাসন পরিচালনা করতেন। দাক্ষিণাত্য এবং দক্ষিণ ভারতের রাজগণ কেবল তাঁর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। পশ্চিম ভারতের শকগণ অপরাজিত থেকে গিয়েছিল। পঞ্জাব ও রাজস্থানে উপজাতি অধ্যুষিত গণরাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্ত প্রত্যক্ষভাবে শাসন করতেন না। যদিও তিনি অবশ্যই এবং শেষপর্যন্ত তাদের ক্ষমতা নাশ করেছিলেন। কুষাণদের তিনি পরাজিত করেছিলেন এই দাবি সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে; অবশ্য কুষাণ শক্তি তখন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছিল। একটি চিনা উৎস থেকে জানা যায়, শ্রীলঙ্কার রাজা মেঘবর্মণ (খ্রিস্টীয় ৩৫২-৭৯) সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং গয়ায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে না যে শ্রীলঙ্কার শাসক সমুদ্রগুপ্তের অধীন কোনো করদ রাজা ছিলেন। যাই হোক সমুদ্রগুপ্ত একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন এবং একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে বিজয় উৎসব উদ্‌যাপন করেন।

এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় সমুদ্রগুপ্ত কেবল রাজ্যবিজেতা নন; তিনি ছিলেন কবি, সংগীতজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী। তাঁর রচিত কাব্য অবশ্য পাওয়া যায়নি; তবে তাঁর সংগীতানুরাগের নিদর্শন রূপে রয়ে গেছে তাঁর বীণাবাদনরত মূর্তি অঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা। বলা হয়েছে তিনি ছিলেন প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধুর পৃষ্ঠপোষক। অবশ্য কোনো কোনো পণ্ডিত এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন ও একে সংগঠিত করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। খ্রিস্টীয় ৩৭৫ থেকে ৪১৫ সাল পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। বিশাখদত্ত রচিত *দেবীচন্দ্রগুপ্তম* থেকে জানা যায়, সমুদ্রগুপ্তের পর গুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন রামগুপ্ত। তিনি শকদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। তিনি পত্নী ধ্রুবাদেবীকে তাদের কাছে সমর্পণ করতে রাজি হন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং শকরাজের কাছে হাজির হন। এর ফলে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এর জেরে চন্দ্রগুপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা ও তাঁর বিধবা পত্নী ধ্রুবাদেবীকে বিবাহ করেন। মধ্যপ্রদেশের ভিলসার নিকটে রামগুপ্তের মুদ্রা পাওয়া গেছে। কয়েকটি লেখ থেকেও জানা গেছে চন্দ্রগুপ্তের পত্নীর নাম ছিল ধ্রুবাদেবী। এই নির্দশন 'দেবীচন্দ্রগুপ্তম'-এ বর্ণিত ঘটনাকে বিশ্বাস্য করে তুলেছে।

Scanned with CamScanner

শকদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অভিযানে শেষপর্যন্ত শকদের পরাজয় ঘটে এবং পশ্চিম ভারত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। অন্তত কিছুকালের জন্য পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত হয় এবং পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলির ওপরে গুপ্তদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বেশ কয়েকটি রাজবংশের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি নাগ পরিবারের কুবেরনাগাকে বিবাহ করেন। এই রানির কন্যাই হলেন প্রভাবতী গুপ্ত। মধ্যভারতে আগে যে অঞ্চল সাতবাহনদের শক্তিকেন্দ্র ছিল সেখানে এখন যাঁরা রাজত্ব করছিলেন সেই বাকাটক রাজবংশের দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে প্রভাবতীর বিবাহ দেওয়া হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি খ্রিস্টীয় ৩৯০ থেকে ৪১০ সাল পর্যন্ত রাজপ্রতিনিধি রূপে রাজ্য শাসন করেন। এইভাবে বাকাটক রাজ্য প্রকৃতপক্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। সম্ভবত কদম্বরাজ ককুৎস্থবর্মণ, যিনি কুন্তল অঞ্চলে (কোঙ্কন) রাজত্ব করতেন গুপ্ত পরিবারে তাঁর কন্যার বিবাহ দেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অভিধা (সূর্যের মতো পরাক্রান্ত) গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল কেবল যুদ্ধবিগ্রহের জন্য নয়, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার কালিদাস তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন বলে কথিত।

কুমারগুপ্ত (৪১৫-৫৪) পিতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী ছিলেন। মধ্য এশিয়ার হুনদের একটি শাখা ব্যাকট্রিয়া অধিকার করে এবং হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করার উপক্রম করে। কিন্তু কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে তারা দূরের বিপদ রূপে থেকে যায়। সামগ্রিকভাবে কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল ছিল শান্তিপূর্ণ।

হুনদের তরফ থেকে বিপদ বাস্তব রূপ নেয় কুমারগুপ্তের উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে। সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব তাঁকেই গ্রহণ করতে হয়। স্কন্দগুপ্ত বীরত্বের সঙ্গে হুনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কয়েকটি ঘরোয়া কারণে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়েছিল। তাঁর অধীনস্থ সামন্তগণ সম্ভবত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তাঁর খাদ মিশানো ধাতুর মুদ্রা সাম্রাজ্যের গভীর অর্থনৈতিক সংকটের পরিচায়ক। তথাপি তিনি হুনদের বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ করেন এবং সম্ভবত যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

৪৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে গুপ্তবংশের কয়েকজন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু সাম্রাজ্য অটুট রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পঞ্চম শতকের শেষ দিকে গুপ্ত শক্তির ওপর বড়ো রকমের আঘাত আসে। হুনগণ বিশাল সংখ্যায় উত্তর ভারতে প্রবেশ করে। অতি চমৎকার তিরন্দাজ ও দক্ষ ঘোড়সওয়ার ধাতব রেকাব ব্যবহারকারী হুনগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে এবং অর্ধ শতাব্দী কালের মধ্যেই এর ভগ্নস্তূপের ওপরে বহু সংখ্যক রাজ্য গড়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

টলমলো গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছিল; ঠিক একই সময়ে মধ্যপ্রদেশ থেকে পর্যন্ত উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গড়ে উঠছিল হুন রাজ্য। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হুন রাজা ছিলেন তোরমান। তাঁর রাজ্যকালের প্রথম বর্ষের তারিখযুক্ত বরাহ অবতাররূপী বিষ্ণুর এক বিশাল চতুষ্পদ মূর্তি এরানে পাওয়া গেছে। তিনি নাকি জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। ৫১৫ সালে তাঁর উত্তরাধিকারী রূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন মিহিরকুল। তিনি সাকল (শিয়ালকোট) থেকে রাজ্যশাসন করতেন। জনশ্রুতি অনুসারে, তিনি ছিলেন অত্যাচারী, পৌত্তলিকতা বিরোধী এবং বৌদ্ধদের নিপীড়নকারী, কিন্তু তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান শৈব এবং মিহিরেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মিহিরকুল মালবের যশোধর্মণের নিকটে ও পরে গুপ্তবংশীয় নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের নিকটে পরাজিত হন। কিন্তু হুন শক্তির পতনের ফলে যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান ঘটেছিল তা নয়।

কেবল হুণ আক্রমণ দিয়েই গুপ্তশক্তির বিপর্যয়ের ব্যাখ্যা করা যায় না। গুপ্ত সাম্রাজ্য যেভাবে সংগঠিত হয়েছিল তারই অনিবার্য পরিণতি সম্ভবত এই বিপর্যয়। গুপ্তরাজগণ *মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, পরমদৈবত, চক্রবর্তী* ইত্যাদি জাঁকালো অভিধা গ্রহণ করতেন। মৌর্য রাজগণ এমনটি করেননি। গুপ্তদের উল্লিখিত উপাধি ধারণের ইঙ্গিত হয়তো এই যে সাম্রাজ্যের ভিতরে বহু ছোটো-ছোটো রাজা ছিলেন যাঁদের যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। গুপ্তদের অধিকৃত রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলেই ছিল উল্লিখিত সামন্ত রাজগণের শাসন, যেমন মধ্য ভারতের *পরিব্রাজক* উচ্ছকল্প রাজপুত্রগণ এবং আরও অনেকে যাঁদের সমুদ্রগুপ্ত পরাস্ত করেন। কেবল বাংলা, বিহার আর উত্তরপ্রদেশ অর্থাৎ সাম্রাজ্যের মূল অংশ ছিল গুপ্ত সম্রাটদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। গুপ্তদের অধীনস্থ প্রধান সামন্ত রাজগণ ছিলেন বলভীর মৈত্রকগণ, থানেশ্বরের বর্ধনগণ, কনৌজের মৌখরীগণ, মগধের পরবর্তী গুপ্তগণ এবং বাংলার চন্দ্র রাজগণ। সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছায়ায় পর্যবসিত হয়।

মৌর্যদের যেমন বিশাল পেশাদার সেনাবাহিনী ছিল, গুপ্ত রাজগণের তা ছিল না। যে প্রশস্তিটি সমুদ্রগুপ্তকে সর্বরাজোচ্ছেত্তার গৌরবে ভূষিত করেছে তা তাঁর সামরিক সরঞ্জাম সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করে না। যদিও চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্তরাজ্য পরিদর্শন করেছিলেন তিনিও গুপ্ত সেনাবাহিনীর সেনাসংখ্যা সম্পর্কে কোনো আভাস দেননি। সম্ভবত সামন্ত রাজগণের সরবরাহ করা সেনাই গুপ্ত সামরিক শক্তির প্রধান অংশ ছিল। হাতি আর ঘোড়া ছিল প্রাচীন সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; অথচ এদের ওপর গুপ্ত রাজগণ একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেননি। এই সব কারণে সামন্তদের ওপর নির্ভরতা ক্রমেই বেড়ে

Scanned with CamScanner

চলে এবং অন্তত সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে সামন্তদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংগঠিত ও ব্যাপক কোনো আমলাতন্ত্রও গুপ্তদের ছিল না। প্রধান রাজকর্মচারীরা নিযুক্ত হতেন *কুমারমাত্যদের* মধ্য থেকে। তাঁদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হতেন মন্ত্রী, *সেনাপতি, মহাদণ্ডনায়ক, সান্ধিবিগ্রহিক* প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ রাজপুরুষ। অনেক সময় একই ব্যক্তির হাতে বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির রচয়িতা হরিষেণ অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। রাজাই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নিযুক্ত করতেন। অনেক সময় একই ব্যক্তির বংশানুক্রমিকও হয়ে উঠেছিল। তার ফলে প্রশাসনের ক্ষেত্রে রাজকর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়েছিল।

পুরোহিতদের এবং মন্দিরগুলিকে ভূমি ও গ্রাম দান বৃদ্ধির কারণে প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। এই প্রক্রিয়ার সূচনা সাতবাহনদের রাজত্বকালে, তার প্রক্রিয়াটি ব্যাপকতা লাভ করে বাকাটক রাজত্বকালে; যদিও এঁদের অধিপতি গুপ্তরাজগণ কর্তৃক এই ধরনের দানের সংখ্যা খুবই কম। ধর্মীয় দান-ধ্যান প্রথার শুরু আদি মহাকাব্যের কাল থেকে। পুরাণে পাওয়া যায় *কলিযুগ* বা সামাজিক সংকটের বর্ণনা যেমন উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সংঘাত যার পরিণাম উৎপাদনের কাজ করতে শূদ্রদের আর কর দিতে বৈশ্যদের অস্বীকৃতি। আগে রাষ্ট্র তার নিজস্ব কর্মচারীদের মাধ্যমে সরাসরি কর আদায় করত এবং পুরোহিত, সেনা ও অন্যান্য কর্মচারীদের কাজের পরিবর্তে বেতন দিত। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই দায়িত্ব সরকার ত্যাগ করে। বরং কাজ করার জন্য যাদের বেতন দিতে হত সরাসরি তাদের কর আদায়ের অধিকার দান অনেক বেশি সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হল।

পুরোহিতদের ও মন্দিরগুলিকে পরবর্তীকালে রাজকর্মচারীদের ভূমিদান করা শুরু হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দেওয়া হয় আর্থিক ও প্রশাসনিক নানা বিষয়ে অব্যাহতি। এর ফলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। ভূমিদানের সঙ্গে যেসব আর্থিক সুবিধা দেওয়া হত তার মধ্যে ছিল লবণ আর খনির ওপরে অধিকার। মৌর্য আমলে এদের ওপর ছিল রাজকীয় একচেটিয়া অধিকার, যা ছিল রাজার সার্বভৌমত্বের নির্দেশক। এখন গ্রামদান শুরু হল 'চিরন্তন অধিকার', অনেক সময় প্রশাসনিক অধিকার, মঞ্জুর করার মাধ্যমে। যেসব গ্রাম দান করা হত তাদের অধিবাসী, চাষি আর কারিগরগণ শাসকদের কাছ থেকেই নির্দেশ পেতেন দানগ্রহীতাকে কর দিতে এবং তাঁর আদেশ মেনে চলতে। মধ্য ভারতে প্রাপ্ত কয়েকটি লেখ থেকে এমন কথাই জানা যায়। উত্তর ভারতে দানগ্রহীতা তস্কর ও অন্যান্য অপরাধীদের দণ্ডদানের ক্ষমতা লাভ করে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে পরবর্তী বহুকাল তাঁরা বেসামরিক

Scanned with CamScanner

বিচার পরিচালনার অধিকারও লাভ করে। বিচার ক্ষমতা, পুলিশি ক্ষমতা এবং আর্থিক বিষয়ে অধিকার দানগ্রহীতাকে হস্তান্তরিত করার ফলে কেবল যে রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল তা নয়; যেসব গ্রাম দান করা হয় সেইসব গ্রামের বাসিন্দা ও কৃষকেরা অত্যাচারের শিকার হয়ে পড়ে। এদের বলা হয়েছিল নতুন মালিকের প্রতি অনুগত থাকতে ও তাঁর আদেশ মেনে চলতে।

ভূমিদান সামন্ত সমাজের উদ্ভবের পথ প্রশস্ত করে। বেশ কয়েকটি লেখতে ভূমিদাস প্রথার উদ্ভবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর অর্থ কোনো ভূমিখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের সেই ভূমিখণ্ড দান করার পরেও তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। সম্ভবত প্রাচীন কালে কোনো সময়ে দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা শুরু হয়, কারণ তৃতীয় শতকের একটি পল্লব লেখ থেকে জানা যায় ভূমিখণ্ড একজন ব্রাহ্মণকে দান করার পরেও তার সঙ্গে যুক্ত চারজন ভাগচাষি ওই ভূমিখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকে যায়। ফা-হিয়েনের বিবরণ অনুসারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য মঠ নির্মাণের সময় তাতে যেমন বাড়িঘর, বাগান আর জমি থাকত, তেমনি থাকত কৃষিকাজের জন্য কৃষক আর গবাদিপশু। উত্তর ভারতের লেখ থেকে অবশ্য এর কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। কিন্তু গুজরাট, মধ্য ভারত আর উড়িষ্যায় প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের লেখ থেকে জানা যায় ভূমি অন্যকে দান করার পরেও বাসিন্দা কৃষকদের সেই ভূমিতেই থাকতে হত। অবশ্য খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ নাগাদ ভূমির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদেরও হস্তান্তরিত হওয়ার প্রথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। এর ফলে কৃষকেরা স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার হারায় এবং ভূমিদাস বা অর্ধ-ভূমিদাসে পরিণত হয়।

গুপ্তযুগে ভূমিদাস প্রথার উদ্ভব এবং তার ফলশ্রুতি রূপে কৃষকের চলাচলের অধিকার লোপ দাস প্রথা লোপের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ঘটেছিল। কারণ গুপ্তযুগের ভূমিদান সনদগুলির কোথাও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে দাসদের নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদিও স্মৃতিকার নারদ পনেরো রকমের দাসের উল্লেখ করেছেন তাদের বেশিরভাগই ছিল গার্হস্থ্য কাজে নিয়োজিত। যেমন প্রবেশপথ, পায়খানা কিংবা পথ ঝাঁট দেওয়া, ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য, সুরা ইত্যাদি পরিষ্কার করা, মালিকের শরীর দলাই-মলাই করা কিংবা তার গোপনাঙ্গ মালিশ করা। যারা কৃষি কাজে রত নারদ তাদের শুদ্ধ কাজের লোক বলে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাদের দাস শ্রেণীর মধ্যে ফেলেননি। দাস প্রথা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে কৃষকদের দুর্দশার লাঘব ঘটেছিল।

ভূমি ও গ্রাম যিনি দান হিসেবে পেতেন তিনি আবার সেই দানের ভূমি ও গ্রামকে বিলি করার অধিকার ভোগ করতেন। তার ফলে কৃষকের অধিকার আরও হ্রাস

Scanned with CamScanner

পায়। যাদের মধ্যে জমি বিলি করা হত তারা জমি ভোগ করতে বা অন্যকে ভোগ করতে দিতে, কিংবা চাষ করতে দিতে পারত। দান হিসেবে প্রাপ্ত জমি কয়েকটি শর্তে ভাড়া দেওয়া যেত। জমি থেকে ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করার অধিকার ভূমিগ্রহীতার ছিল। সুতরাং জমিবিলি ব্যবস্থার ফলে ভাড়াটিয়া মালিকের স্থায়ী অধিকার পেতেন না, যে-কোনো সময়ে ভূমিগ্রহীতা তাকে বিতাড়িত করতে পারতেন।

গুপ্তযুগে ও তার পরবর্তীকালে বলপূর্বক খাটানো (*বিষ্টি*) এবং নতুন জোর-জবরদস্তিমূলক কর এবং স্বাভাবিক কর আদায় কৃষকদের দুরবস্থা আরও বাড়িয়ে দেয়। মৌর্যযুগে দাস ও ভাড়াটে মজুরদের জোর করে খাটানো হত। এই কাজের তদারকি করতেন একজন বেতনভোগী তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু গুপ্ত যুগে ও তার পরবর্তীকালে সব শ্রেণীর মানুষদেরই জোর করে খাটানো শুরু হয় এবং তাদের দিয়ে সব রকমের কাজ করানো হতে থাকে। বাৎসায়নের *কামসূত্র* থেকে জানা যায় কৃষক রমণীদের নানা কাজে বেগার খাটানো হত; যেমন গ্রাম-প্রধানের গোলা ভর্তি করা, জিনিসপত্র বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়া, কিংবা বাড়ির বাইরে নিয়ে আসা, বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করা, মাঠে কাজ করা; কার্পাস তুলা, কাঠ, শণ, ভাং এবং সুতা কেনা এবং বিভিন্ন জিনিসের বদলা-বদলি আর কেনাবেচা। সমসাময়িক বিভিন্ন লেখ, বিশেষত বাকাটক লেখ থেকে জানা যায় যে রাজার সেনাবাহিনী যখন কোনো গ্রামে অবস্থান করত কিংবা কোনো গ্রামের মধ্য দিয়ে যেত তখন গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করা হত এবং তাদের বাধ্য করা হত সেনাদের রসদ সরবরাহ করতে। ফুল আর দুধের জোগান গ্রামবাসীদের দিতে হত। পরিবহনের জন্য জোগান দিতে হত বলদ। তাছাড়া গ্রামবাসীদের কাছ থেকে নতুন বিভিন্ন কর আদায় করা হত। এ সবের ফলে কৃষকদের করের বোঝা বেড়েই চলেছিল। জোর পূর্বক খাটানো, কর আদায় নিপীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল দানগ্রহীতা কর আদায় করার অধিকার লাভ করাতে। রাষ্ট্রের তরফ থেকে মৌর্যযুগে রাজকর্মচারীরা কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করত। তার চাইতে গুপ্তযুগের ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশি নিপীড়নমূলক। গ্রামের সম্পদ শোষণে ভূমিগ্রহীতাদের বংশানুক্রমে কায়েমি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং ভূমিদান প্রথার ফলে সামন্ততান্ত্রিক কৃষিকেন্দ্রিক সম্পর্ক ও শোষণের উদ্ভব ঘটে যার পরিণাম আবার সামাজিক সংঘাতের সৃষ্টি। পরবর্তী কালে এই সংঘাতের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে প্রান্তিক ও পশ্চাদবর্তী অঞ্চলগুলিতে কৃষির সম্প্রসারণও ঘটেছিল। এইসব অঞ্চলে ভূমিদান হামেশাই হত এবং সেখানে ব্রাহ্মণ গ্রহীতারা তাঁদের অগ্রবর্তী কৃষিসংক্রান্ত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে শুরু করেন। কৃষির সম্প্রসারণের ফলে নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। গুপ্তযুগের শেষ পর্যায় থেকে সমৃদ্ধ কৃষির শক্ত ভিত্তিকে আশ্রয় করে নতুন রাষ্ট্রগুলি গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত

বলা যায়, এই সময়ে সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে বাণিজ্যের প্রধান ভূমিকার অবসান ঘটে।

গুপ্ত যুগের পর থেকে দূরপাল্লার বাণিজ্যের সমাপ্তি ঘটে। খ্রিস্টীয় প্রথম কয়েক শতকের পর থেকেই রোমান মুদ্রার আমদানি বন্ধ হয়ে যায় এবং তার কিছুকাল পরেই রোমান সাম্রাজ্যই ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের (বাইজানটিয়াম) সঙ্গে বাণিজ্য চলেছিল। এই সময়ে বাইজানটিয়ামের অধিবাসীগণ চিনাদের কাছ থেকে রেশম চাষ পদ্ধতি শিখে নেয়। এর ফলে পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। অবাক হওয়ার কারণ নেই, রেশম শিল্পীদের একটি শিল্প গুজরাটে তাদের আদি বাসস্থান ত্যাগ করে দশপুরে (মধ্যপ্রদেশের মান্দাসোর) চলে আসে। সেখানে তারা পূর্বেকার পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণ করে। অবশ্য এমন কথা জানা যাচ্ছে যে ভারতের উপকূল অঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যায়। কিন্তু দেশের ভিতরকার অর্থনীতির ওপর এই বাণিজ্যের তেমন প্রভাব পড়েনি।

দূরপাল্লার বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে উপকূল অঞ্চলের বিভিন্ন নগর এবং তাদের পশ্চাৎভূমির মধ্যেকার সংযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। পণ্য উৎপাদনেও ভাটা পড়ে। বাণিজ্য শিথিল হয়ে পড়ার ফলে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কারিগর ও বণিকদের যাতায়াতও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। গতি হারিয়ে কারিগর শ্রেণী গ্রামে আটকে পড়ে এবং কালক্রমে কৃষকদেরই মতো ভূমিগ্রহীতাদের অধীনে পড়ে। কারুশিল্প ও কারিগরি গ্রামীণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়; যদিও খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে মেহরৌলির (দিল্লি) মরচেবিহীন লৌহ স্তম্ভ কারিগরদের প্রযুক্তি দক্ষতার স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন লেখ থেকে একথাও জানা যায় যে কারিগর ও বণিকদের শ্রেণী (গিল্ড) গুপ্তযুগের কয়েকটি নগরের পৌর শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

গুপ্তযুগের পর থেকে যে ধাতব মুদ্রা কমে এসেছিল তার কারণও ছিল বাণিজ্যে ভাটা। প্রাচীন ভারতে গুপ্ত রাজগণ সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশ করেন। কিছু সংখ্যক মুদ্রা তো কারিগরি দক্ষতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তবে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হত কেবল বড়ো-বড়ো বেচা-কেনা, যেমন জমি বেচা-কেনার কাজে। বাংলায় মুদ্রার এই ধরনের ব্যবহারের কথা জানা গেছে। দৈনন্দিন খুচরো বেচা-কেনায় এই মুদ্রার প্রয়োজন ছিল না। এই যুগে তামা বা রুপার মুদ্রা কম পাওয়া গেছে। ফা-হিয়েন জানিয়েছেন, কড়ি ছিল সাধারণ বেচা-কেনার মাধ্যম।

বাণিজ্যে মন্দা এবং কারিগরি ও পণ্য উৎপাদনের সামগ্রিক অবনতি খ্রিস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বহু নগরের অবক্ষয়ের কারণ হয়। উত্তর ভারতের কুষাণদের সমকালীন বহু নগরকেন্দ্র, যেমন কৌশাম্বী (এলাহাবাদ), হস্তিনাপুর, পুরানা কিলা,

বলা যায়, এই সময়ে সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে বাণিজ্যের প্রধান ভূমিকার অবসান ঘটে।

গুপ্ত যুগের পর থেকে দূরপাল্লার বাণিজ্যের সমাপ্তি ঘটে। খ্রিস্টীয় প্রথম কয়েক শতকের পর থেকেই রোমান মুদ্রার আমদানি বন্ধ হয়ে যায় এবং তার কিছুকাল পরেই রোমান সাম্রাজ্যই ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের (বাইজানটিয়াম) সঙ্গে বাণিজ্য চলেছিল। এই সময়ে বাইজানটিয়ামের অধিবাসীগণ চিনাদের কাছ থেকে রেশম চাষ পদ্ধতি শিখে নেয়। এর ফলে পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। অবাক হওয়ার কারণ নেই, রেশম শিল্পীদের একটি নিগম গুজরাটে তাদের আদি বাসস্থান ত্যাগ করে দশপুরে (মধ্যপ্রদেশের মান্দাসোর) চলে আসে। সেখানে তারা পূর্বেকার পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণ করে। অবশ্য এমন কথা জানা যাচ্ছে যে ভারতের উপকূল অঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যায়। কিন্তু দেশের ভিতরকার অর্থনীতির ওপর এই বাণিজ্যের তেমন প্রভাব পড়েনি।

দূরপাল্লার বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে উপকূল অঞ্চলের বিভিন্ন নগর এবং তাদের পশ্চাৎভূমির মধ্যেকার সংযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। পণ্য উৎপাদনেও ভাটা পড়ে। বাণিজ্য শিথিল হয়ে পড়ার ফলে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কারিগর ও বণিকদের যাতায়াতও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। গতি হারিয়ে কারিগর শ্রেণী গ্রামে আটকে পড়ে এবং কালক্রমে কৃষকদেরই মতো ভূমিগ্রহীতাদের ভাগে পড়ে। কারুশিল্প ও কারিগরি গ্রামীণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়; যদিও খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে মেহরৌলির (দিল্লি) মরচেবিহীন লৌহ স্তম্ভ কারিগরদের প্রযুক্তি দক্ষতার স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন লেখ থেকে একথাও জানা যায় যে কারিগর ও বণিকদের শ্রেণী (গিল্ড) গুপ্তযুগের কয়েকটি নগরের পৌর শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

গুপ্তযুগের পর থেকে যে ধাতব মুদ্রা কমে এসেছিল তার কারণও ছিল বাণিজ্যে ভাটা। প্রাচীন ভারতে গুপ্ত রাজগণ সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশ করেন। কিছু সংখ্যক মুদ্রা তো কারিগরি দক্ষতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তবে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত হত কেবল বড়ো-বড়ো বেচা-কেনা, যেমন জমি বেচা-কেনার কাজে। বাংলায় মুদ্রার এই ধরনের ব্যবহারের কথা জানা গেছে। দৈনন্দিন খুচরা বেচা-কেনায় এই মুদ্রার প্রয়োজন ছিল না। এই যুগে তামা বা রূপার মুদ্রা কম পাওয়া গেছে। ফা-হিয়েন জানিয়েছেন, কড়ি ছিল সাধারণ বেচা-কেনার মাধ্যম।

বাণিজ্যে মন্দা এবং কারিগরি ও পণ্য উৎপাদনের সামগ্রিক অবনতি খ্রিস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বহু নগরের অবক্ষয়ের কারণ হয়। উত্তর ভারতের কুষাণদের সময়কার বহু নগরকেন্দ্র, যেমন কৌশাম্বী (এলাহাবাদ), হস্তিনাপুর, পুরান কিলা,

Scanned with CamScanner

(দিল্লি), অহিচ্ছত্র ও তক্ষশিলায় এই সময়ে অবক্ষয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। খ্রিস্টীয় প্রথম দিকের শতকগুলিতে অযোধ্যা ও মথুরা ছিল যথারীতি সমৃদ্ধ নগর। গুপ্তযুগে এরা গুরুত্ব হারায়। অবশ্য পরে রাম ও কৃষ্ণের সঙ্গে এদের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে ক্ষতি অনেকটাই পূরণ হয়ে যায়। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাটের বহু নগরের (নোহ্, উজ্জয়িনী, নগর ইত্যাদি) অবনতি ঘটে। একই অবস্থা দেখা যায় কৌণ্ডিন্যপুর, পৈঠান এবং নাসিক (মহারাষ্ট্র), অমরাবতী এবং ধরণীকোটা (অন্ধ্রপ্রদেশ), তাদপাও-মাধবপুর, ব্রহ্মগিরি এবং চন্দ্রবল্লী (কর্ণাটক) ইত্যাদি কেন্দ্রগুলিতে। দূর দক্ষিণে আরিকামেডু ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নগর; কিন্তু খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের পরে তা আর অর্থনৈতিক দিক থেকে সক্রিয় ছিল না। গুপ্ত সাম্রাজ্যের হৃদয়ভূমিতেও বিভিন্ন স্থানে নগরের অবক্ষয় চোখে পড়ে। বৈশালীতে (বিহারের মুজফ্‌ফরপুর জেলার বাসার) আগেকার যুগের বাড়ি-ঘরের তুলনায় গুপ্ত যুগের বাড়িঘর অনেক কম আকর্ষণীয়। পাটলিপুত্র (পাটনা) সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। উৎখননের মাধ্যমে সোহ্‌গৌরা (গোরখপুর জেলায়) কোনো স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া যায়নি, যদিও বলা হয়েছে মৌর্যযুগে এখানে দুটি শস্যাগার ছিল। যদিও মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনকেন্দ্র, তথাপি গুপ্তযুগে বারাণসী নগরেরও অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যায়।

গুপ্তযুগে সব নগরকেন্দ্রই যে একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছিল তা নয়। বিত্তবান নাগরিকগণ আরামে আয়াসে জীবনযাপন করছেন এমনও দেখা যাচ্ছে। উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণ নাগরিক কীভাবে চিত্ত বিনোদন আর রুচিসুন্দর জীবনযাপন করবেন সেই বর্ণনাই দিয়েছে *কামসূত্র*। সমাবেশে কবিতা আবৃত্তি করা হত; পরিবেশন করা হত সংগীত। কামকলা বিষয়ে তরুণদের তালিম নিতে হত। নগরনটীদের ঘৃণার চোখে দেখা হত না। তিনি ছিলেন নগর জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ। কালিদাস বিদিশার গণিকাদের সঙ্গে তরুণ নাগরদের কামক্রীড়ার উল্লেখ করেছেন। বিশাখদত্তের *মুদ্রারাক্ষস* থেকে জানা যায় উৎসবের সময় রাজধানীর রাজপথগুলিতে গণিকারা ভিড় করত। ধর্মশাস্ত্র রচয়িতাগণ বারবনিতাদের প্রতি অকরুণ মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু কৌতুকের বিষয়, পরবর্তীকালে দেবতাদের সঙ্গে এদের বেশি বেশি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কালিদাস উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে তরুণীদের অবস্থানের উল্লেখ করেছেন। তবে দেবদাসীদের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে রামগড়ের (বেনারসের ২৫৬ কিলোমিটার দক্ষিণে) একটি গুহালেখতে। সম্ভবত অশোকের রাজত্বকালের কিছু পরে।

নারীদের সামাজিক অবনতি বেড়েই চলেছিল। গুপ্তযুগে যে পরিবর্তনগুলি দেখা গিয়েছিল পরবর্তীকালে সেগুলিই বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। নিয়মিত শিক্ষালাভের অধিকার নারীদের ছিল না; যদিও শূদ্রদের মতো মহাকাব্য ও পুরাণ পাঠ শ্রবণের অধিকার

Scanned with CamScanner

সাধারণ ছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নারী আচার্য, দার্শনিক এবং চিকিৎসকের উল্লেখ পাওয়া যায়; তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। স্মৃতিকারগণ প্রায় সকলেই বাল্যবিবাহের পক্ষে মত দিয়েছেন। এমনকি বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই বিবাহের নির্দেশ কোনো-কোনো স্মৃতিকার দিয়েছেন। বিধবাদের কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত। সতীদাহ প্রথা আইন শাস্ত্রজ্ঞদের অনুমোদন লাভ করেছিল; যদিও এই প্রথা উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্যে কেবল প্রচলিত ছিল। সতী প্রথার প্রথম স্মারকটি পাওয়া গেছে মধ্যপ্রদেশের এরান থেকে। এর তারিখ ৫১০ সাল। তবে এই প্রথার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তীকালে। স্ত্রীধন অর্থাৎ পোশাক পরিচ্ছদ ও অলংকার ছাড়া আর কোনো সম্পত্তির অধিকার নারীদের ছিল না। তাদের চিরকালীন অধীনতার কথা বারবার জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার ওপর গড়ে ওঠা পুরুষপ্রধান শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সমাজদর্শন যে নারীদের অধীনতা ক্রমশ বেশি করে দাবি করবে এ তো স্বাভাবিক। এর বিকল্প রূপে সামান্য সংখ্যক নারী সন্ন্যাসিনী, নগরনটী হতে কিংবা নৃত্য-গীত শিল্পীদের দলে ভিড়ে যেতে পারত।

গুপ্ত যুগের সামাজিক সংগঠনে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেণী স্বার্থের সমসাময়িক সাহিত্যে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। বরাহমিহির নির্দেশ দিচ্ছেন, একজন ব্রাহ্মণের বাড়িতে পাঁচটি ঘর থাকবে, ক্ষত্রিয়ের বাড়িতে থাকবে চারটি, বৈশ্যের বাড়িতে তিনটি আর শূদ্রের বাড়িতে দুটি। তিনি আরও বলেছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে প্রধান কক্ষটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিভিন্ন হবে। বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন রকম সুদের হার আগের যুগে যেমন ছিল গুপ্তযুগেও সে-রকমই দেখা যায়। গুপ্তযুগে সংকলিত একটি পুরাণ সাদা, লাল, হলুদ আর কালো রঙকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের অনুরূপ রূপে উল্লেখ করেছে। এ থেকে চারটি শ্রেণীর সামাজিক অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগের গ্রন্থ জোর দিয়ে বলেছে ব্রাহ্মণ যেন শূদ্রের কাছ থেকে খাদ্যগ্রহণ না করেন, কেন না তা করলে ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক শক্তি হ্রাস পাবে। আইন সংক্রান্ত বিষয়েও বর্ণভেদ মেনে চলা হত। একটি স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দেশ রয়েছে অপরাধ নির্ণয়ের জন্য ব্রাহ্মণের পরীক্ষা হবে তুলাদণ্ড দ্বারা, ক্ষত্রিয়ের অগ্নি দ্বারা, বৈশ্যের জলের দ্বারা এবং শূদ্রের ক্ষেত্রে বিষপানের দ্বারা। মামলার ব্যাপারে বিচারশালায় যে অর্থ জমা দেওয়ার রীতি ছিল সেখানেও ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের মধ্যে পার্থক্য করা হত। উত্তরাধিকার আইনের বেলায়ও পক্ষপাতিত্ব করা হত। উচ্চবর্ণের কোনো ব্যক্তির শূদ্র পুত্র সম্পত্তির ভাগ সব চাইতে কম পেত। স্মৃতিকার বৃহস্পতির নির্দেশ, ব্রাহ্মণ পুরুষ ও শূদ্র নারীর মিলনের সন্তান ভূমি সংক্রান্ত সম্পত্তির ভাগ পাবে না। তিনি একথাও জানিয়েছেন, কেবল সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরাই সাক্ষী হতে পারবে। অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থের নির্দেশ, কেবল নিজের বর্ণের লোকদের পক্ষেই শূদ্ররা সাক্ষ্য দিতে পারবে। এইসব প্রমাণ করছে আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে শ্রেণীভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

শূদ্র এবং অস্পৃশ্যদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছিল। কোনো শূদ্র কোনো চণ্ডাল নারীর সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হলে সেও চণ্ডাল হয়ে যেত। আগেকার যুগের তুলনায় এই যুগে অস্পৃশ্যতা প্রথা আরও ব্যাপক আর কঠিন আকার ধারণ করে। চণ্ডালের স্পর্শজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান স্মৃতিকারগণ দিয়েছেন। ফা-হিয়েন জানিয়েছেন দরজা দিয়ে নগর বা বাজারে ঢুকবার আগে একজন চণ্ডালকে এক খণ্ড কাঠ দিয়ে শব্দ করে আগে থেকে জানান দিতে হত যাতে অন্য মানুষ তাদের স্পর্শ এড়িয়ে চলতে পারে। সামগ্রিকভাবে অস্পৃশ্যগণ এবং বিশেষভাবে চণ্ডালগণ সমসাময়িক গ্রন্থগুলিতে অত্যন্ত অসম্মানিতভাবে চিত্রিত হয়েছে। অশুদ্ধি, অসত্য, চৌর্য, বিধর্মিতা, অনর্থক কলহ, কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি নানা দোষের আকর রূপে তাদের চিত্রিত করা হয়েছে।

বর্ণ-ব্যবস্থা যে খুব মসৃণভাবে চলেছিল তা নয়। গুপ্তযুগে সংকলিত মহাভারতের শান্তিপর্বে অন্তত নয়টি শ্লোক রয়েছে যেখানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মিলন প্রয়োজনীয় বলে জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে। সম্ভবত এই দুই বর্ণের বিরুদ্ধে বৈশ্য ও শূদ্রদের ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা এসেছিল। একটি শ্লোকে অভিযোগ করা হয়েছে এক সময়ে বৈশ্য ও শূদ্রগণ ইচ্ছাকৃতভাবে ব্রাহ্মণ পত্নীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছেন। প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সম্ভবত শূদ্রগণ সব চাইতে শত্রুভাবাপন্ন ছিল। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে শূদ্রদের রাজার ধ্বংসকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য একটি সমসাময়িক গ্রন্থে তাদের বলা হয়েছে শত্রুভাবাপন্ন, হিংস্র, দাম্ভিক, বদমেজাজি, মিথ্যাবাদী, অত্যন্ত লোভী, অকৃতজ্ঞ, বিধর্মী, অলস ও অশুদ্ধ। এই বর্ণনা এবং অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থের শ্লোক থেকে শূদ্র এবং শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার বিরোধের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে শূদ্রদের বিদ্রোহের বাস্তব ঘটনার উল্লেখ গুপ্ত যুগের ঐতিহাসিক উপাদানে পাওয়া যায় না।

বর্ণভিত্তিক সামাজিক বিন্যাস অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উচ্চশ্রেণীর মানুষ ধর্মকে হামেশাই ব্যবহার করত। *গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বৈশ্য, শূদ্র ও নারীদের হীনবংশজাত আখ্যা দিয়েছেন। গুপ্ত যুগের বিভিন্ন গ্রন্থে এই বক্তব্য জোরালোভাবে প্রকাশিত দেখা যায়। মহাভারতের একটি অংশে বলা হয়েছে যে কেবল দ্বিজদের সেবা আর ঈশ্বরে ভক্তির মাধ্যমে শূদ্রগণ মোক্ষলাভ করতে পারে। এই গ্রন্থে এবং পুরাণে বলা হয়েছে সৎ কাজের মাধ্যমে শূদ্রের পক্ষে পরের জন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্ভব। কর্মবাদ থেকে এই ধারণার জন্ম। এর অর্থ একজন মানুষের ভাগ্য, সামাজিক মর্যাদা, সুখ দুঃখ নির্ভর করে তার পূর্বজন্মের কর্মফলের ওপর। কর্ম (আক্ষরিক অর্থে 'কাজ' বা 'কর্ম') হল বীজের মতো যা আগের ঋতুতে রোপণ করা হলে পরে পেকে উঠবে। কর্মফলের ধারণা সব বর্ণের মানুষের মনেই আবেদন সৃষ্টি করে; কারণ যদি তার হিসেবের খাতায় তেমন

Scanned with CamScanner

কর্মফল জমা থাকে তাহলে একজন শূদ্রও আশা করতে পারে সে পরজন্মে রাজা হয়ে জন্মাতে পারে। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকে বলদে-টানা এক শকটের চালক বসন্তসেনাকে হত্যা করতে রাজি হচ্ছে না, কারণ যে পাপে সে দাস হয়ে জন্মেছে পুনরায় সেই অপরাধ করতে সে রাজি নয়। এই বিশ্বাসের কারণে জনসাধারণ তাদের দুঃখকষ্টের জন্য মানুষকে দায়ী না করে প্রতিটি বর্ণের জন্য নির্দেশিত কর্তব্য পালনের ওপর জোর দেয়।

প্রথমে গীতায় বিবৃত এবং বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্মের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিরূপে ভক্তি গুপ্তযুগ থেকে উত্তরোত্তর সামাজিক প্রাসঙ্গিতা লাভ করে। ভক্তি-র প্রবক্তাগণ প্রচার করেন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের মাধ্যমেই কেবল একজন মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে; যাগযজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে নয়। ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ সম্ভব। সমকালীন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নতুন এই ভক্তিধর্ম ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সময়ে সামন্তগণ মনে করতেন তাঁরা প্রভুর চরণপ্রান্তে বসে ধ্যান করছেন। এই কারণেই গুপ্তযুগে ও পরবর্তী গুপ্ত যুগে বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম, মহাযান বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদকে গুরুত্ব পেতে দেখা যায়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, বৈষ্ণবধর্ম এবং কিছু পরিমাণে শৈবধর্মের অবতারবাদ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অবতারবাদ প্রথম দেখা যায় গীতায়; পরে বৌদ্ধধর্মের বোধিসত্ত্ব ধারণার প্রভাবে এর বিকাশ। কয়েকটি গ্রন্থ অনুসারে বিষ্ণু উনচল্লিশ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন, যদিও বেশিরভাগ তালিকায় অবতারের সংখ্যা দশ। এই অবতারগণ হলেন—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কি। গুপ্তযুগের গ্রন্থ *বায়ুপুরাণে* অবশ্য তালিকাটি ভিন্ন। এই তালিকার অবতারগণ হলেন : নারায়ণ, নরসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, মান্ধাতা, জামদগ্ন্য, রাম, বেদব্যাস, কৃষ্ণ এবং কল্কি। প্রথম তিন অবতার দেবতা, বাকি সব মানুষ রূপে বর্ণিত। প্রতিটি অবতার হয়ে বিষ্ণু আবির্ভূত হয়েছিলেন পরিত্রাতা রূপে। মনে করা হয় কলি যুগের শেষে তিনি ম্লেচ্ছদের নির্মূল করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য কল্কি অবতাররূপে অশ্বপৃষ্ঠে আবির্ভূত হবেন। এইভাবে অবতারবাদ আশা আর বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে যে পৃথিবীর দুঃখ দুর্দশা থেকে তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করতে একজন পরিত্রাতার আবির্ভাব ঘটবে। বিশেষত সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষদের কাছে এই কল্পনার বিশেষ আবেদন ছিল। শৈবরাও অবতারবাদ গ্রহণ করেছিল যদিও শিব প্রধানত লিঙ্গ আকারেই পূজিত হয়েছেন।

যাদের বেশিরভাগই ছিলেন উপজাতিগোষ্ঠী বা পটভূমি থেকে আগত সেই নারী দেবতারা গুপ্তযুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন; এর আগে তাঁদের তেমন গুরুত্ব ছিল না। ভারতে সকল যুগেই মাতৃদেবীর আরাধনা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন এই দেবী আর ছায়াবৃত না থেকে সুস্পষ্টভাবে ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে

কর্মফল জমা থাকে তাহলে একজন শূদ্রও আশা করতে পারে সে পরজন্মে রাজা হয়ে জন্মাতে পারে। শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* নাটকে বলদে-টানা এক শকটের চালক বসন্তসেনাকে হত্যা করতে রাজি হচ্ছে না, কারণ যে পাপে সে দাস হয়ে জন্মেছে আবার সেই অপরাধ করতে সে রাজি নয়। এই বিশ্বাসের কারণে জনসাধারণ তাদের দুঃখকষ্টের জন্য মানুষকে দায়ী না করে প্রতিটি বর্ণের জন্য নির্দেশিত কর্তব্য পালনের ওপর জোর দেয়।

প্রথমে *গীতায়* বিবৃত এবং বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্মের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিরূপে ভক্তি গুপ্তযুগ থেকে উত্তরোত্তর সামাজিক প্রাসঙ্গিতা লাভ করে। ভক্তি-র প্রবক্তাগণ প্রচার করেন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের মাধ্যমেই কেবল একজন মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে; যাগযজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে নয়। ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ সম্ভব। সমকালীন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নতুন এই ভক্তিধর্ম ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সময়ে সামন্তগণ মনে করতেন তাঁরা প্রভুর চরণপ্রান্তে বসে ধ্যান করছেন। এই কারণেই গুপ্তযুগে ও পরবর্তী গুপ্ত যুগে বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম, মহাযান বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদকে গুরুত্ব পেতে দেখা যায়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, বৈষ্ণবধর্ম এবং কিছু পরিমাণে শৈবধর্মের অবতারবাদ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অবতারবাদ প্রথম দেখা যায় গীতায়; পরে বৌদ্ধধর্মের বোধিসত্ত্ব ধারণার প্রভাবে এর বিকাশ। কয়েকটি গ্রন্থ অনুসারে বিষ্ণু উনচল্লিশ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন, যদিও বেশিরভাগ তালিকায় অবতারের সংখ্যা দশ। এই অবতারগণ হলেন— মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কি। গুপ্তযুগের গ্রন্থ *বায়ুপুরাণে* অবশ্য তালিকাটি ভিন্ন। এই তালিকার অবতারগণ হলেন ঃ নারায়ণ, নরসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, মান্ধাতা, জামদগ্ন্য, রাম, বেদব্যাস, কৃষ্ণ এবং কল্কি। প্রথম তিন অবতার দেবতা, বাকি সব মানুষ রূপে বর্ণিত। প্রতিটি অবতার হয়ে বিষ্ণু আবির্ভূত হয়েছিলেন পরিত্রাতা রূপে। মনে করা হয় কলি যুগের শেষে তিনি ম্লেচ্ছদের নির্মূল করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য কল্কি অবতাররূপে অশ্বপৃষ্ঠে আবির্ভূত হবেন। এইভাবে অবতারবাদ আশা আর বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে যে পৃথিবীর দুঃখ দুর্দশা থেকে তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করতে একজন পরিত্রাতার আবির্ভাব ঘটবে। বিশেষত সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষদের কাছে এই কল্পনার বিশেষ আবেদন ছিল। শৈবরাও অবতারবাদ গ্রহণ করেছিল যদিও শিব প্রধানত লিঙ্গ আকারেই পূজিত হয়েছেন।

যাদের বেশিরভাগই ছিলেন উপজাতিগোষ্ঠী বা পটভূমি থেকে আগত সেই নারী দেবতারা গুপ্তযুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন; এর আগে তাঁদের তেমন গুরুত্ব ছিল না। ভারতে সকল যুগেই মাতৃদেবীর আরাধনা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন এই দেবী আর ছায়াবৃত না থেকে সুস্পষ্টভাবে ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে

Scanned with CamScanner

পড়েন। পরবর্তীকালে মাতৃ দেবীগণ যে প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন তার সূচনা এই সময়েই দেখা গিয়েছিল। শ্রী কিংবা সম্পদ ও প্রাচুর্যের দেবী শ্রী—লক্ষ্মী বৈশ্য ও শূদ্রদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং বিষ্ণুপত্নী রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর এই মিলনের উল্লেখ প্রাচীনতম যে লেখটিতে পাওয়া গেছে সেটি স্কন্দগুপ্তের সময়কার। পার্বতী হলেন শিবের পত্নী। শিব-পার্বতীর বিবাহের প্রথম শিল্পগত রূপায়ণ পাওয়া যাচ্ছে প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে। ব্রাহ্মণ্য দেবমণ্ডলীতে নারী দেবতাদের মিশ্রণের ফলে শাক্ত উপাসনার উদ্ভব ঘটে যার মূল কথা নারীর সঙ্গে মিলনের মাধ্যমেই কেবল পুরুষকে পাওয়া সম্ভব। ব্রাহ্মণ্য ও উপজাতীয় চিন্তাধারার মধ্যে আদানপ্রদান এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে ব্রাহ্মণদের ক্রমাগত বসতি বৃদ্ধি শাক্ত উপাসনার উদ্ভবের পটভূমি রচনা করে। শক্তি উপাসনা পরে তান্ত্রিক ধর্মের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

ব্রাহ্মণ্য সকল ধর্মমতের মধ্যে গুপ্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সব চাইতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বৈষ্ণবধর্ম। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রসার ঘটে, এমনকি সাগর পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। বিষ্ণুর সঙ্গে ধনসম্পদের দেবী শ্রীলক্ষ্মীর মিলন নতুন ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। বৈশ্য আর শূদ্রদের মধ্যে আগে থেকেই জনপ্রিয়তা থাকার দরুন নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে লক্ষ্মী পূজার ব্যাপক চল ঘটে। বিষ্ণু উপাসনা সমাজের সকল শ্রেণীর প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিল। রাজা নিজেকে দেবতার অবতাররূপে পরিচয় দিতে শুরু করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়কার একটি পুরাণে রাজাকে বিষ্ণুর শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এর ফলে রাজশক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পুণ্যার্জনের জন্য ধনী ব্যক্তিরা দেববিগ্রহ স্থাপন ও মন্দির নির্মাণ শুরু করে। পরজন্মে নিজের অবস্থার উন্নতি ও এই জন্মে সান্ত্বনা লাভের জন্য অবতাররূপে ঈশ্বরের আবির্ভাবে বিশ্বাস পোষণ করতে থাকে। বৈষ্ণবধর্মে বিভিন্ন দেবতা, বিশ্বাস এবং কুসংস্কার স্থান পেয়েছিল। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিভিন্ন লৌকিক ধর্মের উপাদান এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং বৈষ্ণবধর্ম যুক্তির পরিবর্তে বিশ্বাসকে গ্রহণ করে। সুতরাং জনসাধারণকে ভাগ্য মেনে নিতে এবং বর্ণভিত্তিক সামাজিক বিভাজন রক্ষায় মোক্ষম হাতিয়ার রূপে কাজ করে।

গুপ্ত যুগে শৈবধর্ম ও শৈব সম্প্রদায়ের নানা শাখার অস্তিত্বের কথা বিভিন্ন উপাদান থেকে জানা যায়। কয়েকটি পুরাণ শিবকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলে অভিহিত করেছে। বৈষ্ণবধর্মের মতো শৈবধর্মও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এই যুগের অন্তত দুটি শিবমন্দির এখনো টিকে আছে, একটি *নাচনা কুঠারে* অন্যটি *নাগোড়ে* (দুটি স্থানই মধ্যপ্রদেশে)। মথুরার একটি ভাস্কর্যে দেখা যায় একজন ভক্ত তার শির শিবকে অর্পণ করছেন। সম্ভবত শৈবদের কোনো-কোনো উগ্রপন্থী সম্প্রদায়

নরবলিও দিত। এই ধরনের উগ্র চরিত্রের জন্য শৈবধর্ম বৈষ্ণবধর্মের মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। গুপ্ত যুগে এই ধর্ম যে কিছু সাফল্য অর্জন করে তার মূলে ছিল এর কিছু-কিছু ধ্যানধারণা আর বৈষ্ণবধর্মের ধ্যানধারণা এক ছিল।

বৌদ্ধধর্ম ইতিমধ্যে দুটি সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। দুটি সম্প্রদায় আবার বহু উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, কাম্বোডিয়া এবং চিন এই সময়ে হীনযান বৌদ্ধমতের কেন্দ্র ছিল। ফা-হিয়েন হীনযান মত প্রচলিত দেখেছিলেন লবনোর, দরদ, উদয়ন, গন্ধার, বান্নু, কনৌজ ও কাশ্মীরে। তবে মহাযান শাখারও প্রচলন ছিল। নাগার্জুন, আর্যদেব, আসঙ্গ, বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগ প্রমুখ মহাযান মতের প্রবক্তাগণ গুপ্তযুগে আবির্ভূত হন। ভক্তি এবং মূর্তিপূজার ওপরে গুরুত্ব আরোপ এবং বহু দেব-দেবীকে এর দেবমণ্ডলীতে স্থান দেওয়ার ফলে মহাযান ধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাছাকাছি চলে আসে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম তার প্রথম দিককার প্রতিবাদী চরিত্র অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। আফগানিস্তান, ভিদা (পঞ্জাব), মথুরা ও পাটলিপুত্রে মহাযান সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ফা-হিয়েনের দেখা হয়েছিল। খোটানে, বলা হয়েছে, সব সন্ন্যাসীরা ছিল মহাযান মতাবলম্বী। আগে বণিকশ্রেণীর কাছ থেকে বৌদ্ধধর্ম যে পৃষ্ঠপোষকতা পেত, বাণিজ্যের অবনতির কারণে পরবর্তী যুগে সেই পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ঘটে। কালক্রমে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি ভূমিদান ও গ্রামদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

জৈনধর্ম ছিল অনেকাংশে রক্ষণশীল। তবে গুপ্তযুগে এই ধর্মে মূর্তির প্রচলন ঘটে। খ্রিস্টীয় ৩১৩ অব্দে মথুরা ও বলভীতে দুটি জৈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জৈন শাস্ত্রগুলি একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালে ৪৫৩ অব্দে বলভীতে অনুষ্ঠিত আরেকটি সম্মেলনে শাস্ত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়। সম্ভবত মথুরা আর বলভী ছিল শ্বেতাম্বর জৈনধর্মের কেন্দ্র আর উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধন ছিল দিগম্বর সম্প্রদায়ের কেন্দ্র। দাক্ষিণাত্য এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে জৈনধর্ম স্থানীয় শাসক পরিবারগুলির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে যদিও পরবর্তীকালে আর এই পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। খ্রিস্টান ধর্ম ছিল মালাবার অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এখানে একটি সিরীয় খ্রিস্টান চার্চের অস্তিত্ব ছিল এবং বোম্বের নিকটে কল্যাণে নাকি পারস্য থেকে একজন বিশপকে পাঠানো হয়েছিল। এখনো ভারতের বেশ কয়েকজন প্রধান নাগরিক এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্ভবের দিক থেকে গুপ্ত যুগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ষড়দর্শনকে কেন্দ্র করে এই সময়েও দার্শনিক তর্কবিতর্ক হতে থাকে, আর ষড়দর্শন ছিল ভারতীয় দর্শনের প্রধান দিক। ছয়টি দর্শন হল : ন্যায় (বিশ্লেষণ), বৈশেষিক (বিশেষ লক্ষণ), সাংখ্য (সংখ্যা গণনামূলক), যোগ, মীমাংসা (অনুসন্ধান) এবং বেদান্ত

Scanned with CamScanner

(বেদের অন্ত)। অক্ষপাদ গৌতমের সূত্রকে ভিত্তি করে তর্কশাস্ত্র ও জ্ঞানতত্ত্ব হল ন্যায়। *অক্ষপাদ গৌতম* সম্ভবত খ্রিস্টাব্দের প্রথম কোনো শতকে আবির্ভূত হন। এই দর্শনের প্রধান প্রবক্তা, পকশিলাস্বামিন বাৎসায়ন খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মানুষ ছিলেন। বৈশেষিক ছিল ন্যায়ের পরিপূরক ও তার চাইতে প্রাচীনতর। এ ছিল পরমাণুতত্ত্ব বিষয়ক দর্শন; ধর্মতত্ত্বের চাইতে পদার্থবিদ্যাই-এর প্রধান উপজীব্য বিষয়। এর কিংবদন্তীখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উলুক কণাদ। তাঁর সর্বপ্রধান টীকাকার প্রশস্তপাদ সম্ভবত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত হন। সাংখ্য পঁচিশটি মূল পদার্থ সম্পর্কে বলেছে, শেখাতে চেয়েছে। এর প্রধান উপস্থাপিত বিষয় পুরুষ (আত্মা, ব্যক্তি) ও প্রকৃতির (বস্তু) সম্পর্ক। সাংখ্যদর্শনের যে প্রাচীনতম গ্রন্থখানি পাওয়া গেছে তা হল ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত *সাংখ্যকারিকা*। গ্রন্থখানি সম্ভবত খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত। যোগ দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন। এর মূল গ্রন্থ পতঞ্জলি-র *যোগসূত্র* খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত। কিন্তু এখন যে আকারে এই গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে তার প্রণেতা ব্যাস, আরও সাতশো বছর পরে যিনি জন্মগ্রহণ করেন। মীমাংসা বেদের ব্যাখ্যা কিংবা বেদকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করে। জৈমিনীর *সূত্র* গ্রন্থকে (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে) এই দর্শনের আদি গ্রন্থ রূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু মীমাংসার প্রাচীন পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন শবরস্বামিন। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে তাঁর আবির্ভাব। 'বেদান্ত'কে ('উত্তর মীমাংসা' নামেও পরিচিত) মনে করা হয় বেদ থেকে উদ্ভূত। বেদান্ত পরিষ্কারভাবে অ-ব্রাহ্মণ্য দার্শনিক তত্ত্বকে বাতিল করে দিয়েছে। মনে করা হয় প্রথম দিকের কোনো শতকে বদরায়ন এর প্রধান সূত্রগুলি রচনা করেন। তবে এই দর্শনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা গৌড়পাদ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়কার মানুষ ছিলেন। তবে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে বেদান্তের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ভাষ্য উপহার দেন শংকরাচার্য। এই সময়ে বেদান্ত দর্শন ভারতীয় দর্শনের প্রধান ধারা হয়ে দাঁড়াল। বিভিন্ন দ্বৈতবাদী মতবাদ থেকে পৃথক ষড়দর্শনকে ভিত্তি করে বিমূর্ত দার্শনিক বিতর্কের কোনো সামাজিক ভিত্তি গুপ্তযুগে ছিল না।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অগ্রগতির সঙ্গে ধর্ম অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিল। ভক্তিবাদ এবং মূর্তি পূজার গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মন্দির নির্মাণও শুরু হয়। মন্দিরে থাকত গর্ভগৃহ যেখানে প্রতিষ্ঠিত হত মূল বিগ্রহ।

গুপ্ত যুগের কয়েকটি মন্দির এখনো টিকে আছে। সাঁচী, লাধখান, দেওগড় (ঝাঁসির কাছে) ভিতরগাঁও, তিগয়া, ভুমারা ইত্যাদি স্থানের মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পাথর অথবা ইটের তৈরি মন্দিরগুলি আকারে ক্ষুদ্র। বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য মন্দিরের ছাদে নল থাকত। সাঁচীর চৈত্য হলের বাম দিকে দণ্ডায়মান মন্দিরটিই হল গুপ্ত যুগের টিকে-থাকা প্রাচীনতম মন্দির। প্রাচীরবেষ্টিত গর্ভগৃহ, সম্মুখভাগে

Scanned with CamScanner

স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ—পরবর্তীকালে নির্মিত সব ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যেরই মূল পরিকল্পনা ছিল এরকম। গুপ্ত যুগে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অলংকৃত ও সুরচিত মন্দির হল দেওগড়ের ভগ্ন বিষ্ণুমন্দির। এই সংস্থানে মূল বর্গাকার মন্দিরের চার কোণে চারটি ছোটো মন্দির থাকে। এই ছোটো মন্দিরগুলিতে অ-প্রধান দেবতা অধিষ্ঠিত থাকতেন। এই মন্দিরটি সম্ভবত প্রাচীনতম 'পঞ্চায়তন' মন্দিরের প্রাচীনতম নিদর্শন। পরবর্তীকালে মন্দিরের এই সংস্থান পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। মন্দিরের এই সংস্থানে প্রতিফলিত হয়েছিল ভারতের চির সম্প্রসারণশীল দেবমণ্ডলীর সামন্ততান্ত্রিক ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ। কিন্তু স্বাধীনভাবে দণ্ডায়মান মন্দির নির্মাণের ফলে গুহা মন্দির নির্মাণ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। অজন্তার গুহা মন্দিরের নির্মাণকাল গুপ্ত যুগ। তবে প্রাচীন ভারতীয় গুহা স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন অষ্টম শতকে নির্মিত ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির।

আগেকার যুগে সূচিত ভাস্কর্যশিল্প চরম উৎকর্ষ অর্জন করে গুপ্ত যুগে। উত্তরপ্রদেশের খৈড়িগড় থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রমাণ আকৃতির চাইতেও বৃহত্তর অশ্বমূর্তি। মনে করা হয়, সমুদ্রগুপ্ত তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে যে ঘোড়া ব্যবহার করেছিলেন আলোচ্য নিদর্শনটি তার প্রতিকৃতি; যদিও কুষাণ ভাস্কর্যের সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে। এই যুগের ভাস্কর্যের মধ্যে প্রধান বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার ও অপ্রধান বৈষ্ণব দেব-দেবীর মূর্তি। শৈব উপাসনায় প্রধান ছিল লিঙ্গ উপাসনা; এর ফলে ভাস্করের কল্পনা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। অবশ্য কয়েকটি শৈব দেবমূর্তি (দুর্গা, স্কন্দ প্রভৃতি) পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ ভাস্কর্য নিদর্শন পাওয়া গেছে মধ্যপ্রদেশের বিদিশা, এরান এবং উদয়গিরি থেকে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল উদয়গিরি। গুপ্ত যুগে পাহাড় কেটে এখানে কুড়িটি কক্ষ নির্মাণ করা হয়। এখানে প্রাপ্ত কয়েকটি মূর্তি নির্দিষ্ট কয়েকজন গুপ্তরাজার আমলের বলে চিহ্নিত করা গেছে যা গুপ্ত যুগের বহু ভাস্কর্যের বেলা সম্ভব হয়নি। গুপ্ত ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান অসংখ্য মূর্তি। এই মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে সারনাথে যেখানে মথুরা শিল্পরীতির প্রভাবে একটি স্বতন্ত্র শিল্পরীতির উদ্ভব ঘটেছিল। সারনাথ ভাস্কর্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ধর্মচক্রপ্রবর্তনমুদ্রা ভঙ্গিতে বুদ্ধের উপবিষ্ট মূর্তি। ধ্যানী করুণাঘন বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচারের অপূর্ব অভিব্যক্তি এই প্রস্তরভাস্কর্য। পূর্ব ও পশ্চিম ভারত এবং দাক্ষিণাত্যে সারনাথ ভাস্কর্যের প্রভাব পড়েছিল। তবে যত দক্ষিণে গেছে তত এই শিল্পধারার প্রভাব হ্রাস পেয়েছে, কারণ সুদূর দক্ষিণে স্থানীয় ধারা প্রধান শিল্পধারা ছিল।

চিত্রশিল্প ছিল অত্যন্ত উন্নত। সাহিত্যের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে পেশাদার শিল্পী তো বটেই, উচ্চশ্রেণীর নারী পুরুষরাও দক্ষতার সঙ্গে তুলি চালাতে পারত। গুপ্ত যুগের চিত্রকলার অবশেষ দেখা যায় বাঘ (খ্রিস্টীয় ৫০০ অব্দের ষষ্ঠ গুহা),

Scanned with CamScanner

অজন্তা (গুহা ষোলো, সতেরো, উনত্রিশ, ১ এবং ২ নং) এবং বাদামি (৩ নং গুহা) গুহা এবং আরও কয়েকটি স্থানে। অজন্তার দেয়াল চিত্র সমসাময়িক সমস্ত চিত্রকলার আদর্শ ছিল। মানুষ এবং জীবজন্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কনে অজন্তা শিল্পী পরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। বোধিসত্ত্ব সর্বত্যাগের ঘোষণা করছেন (১ নং গুহা) কিংবা সপার্ষদ ইন্দ্র তুষিত স্বর্গে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আকাশ পথে উড়ে আসছেন (১৭ নং গুহা) হল অজন্তার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চিত্র। ছাদের নীচের অংশ, স্তম্ভবেদিকা, দরজা ও জানালার চৌকাঠ ইত্যাদির অলংকরণ অজন্তার চিত্রশিল্পীর কল্পনাশক্তি ও তার রূপায়ণের অনন্য নিদর্শন রূপে রয়ে গেছে। যদিও বিষয়বস্তুর দিক থেকে অজন্তার চিত্র ধর্মীয়, কিন্তু এই ছবিতে দেখা যায় রাজা, অভিজাত, যোদ্ধা ও ঋষিদের এক ব্যাপক জীবন আলেখ্য। সামগ্রিকভাবে যে ছবি আমরা পাই তা উচ্চশ্রেণীর মানুষের সচ্ছল জীবনের; গ্রামের মানুষের স্বাভাবিক ক্লিষ্ট কঠোর জীবনচিত্র অজন্তায় অনুপস্থিত।

শিল্প স্থাপত্যের মতো সাহিত্যেও গুপ্ত যুগ ছিল পুষ্পায়নের যুগ। কয়েক শতক ধরে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন এবং রাজাদের অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতা লাভের কারণে এই ভাষা ও সাহিত্যের ধ্রুপদী পর্যায়ে উত্তরণ ঘটে। এই যুগের পরিচিত সংস্কৃত কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কালিদাস। তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা অলংকৃত করেন। একশোরও কিছু বেশি গীতিকবিতার স্তবক নিয়ে রচিত তাঁর মেঘদূত কাব্যে বিরহী যক্ষ উত্তরের পর্বতে অবস্থিত অলকাপুরীতে তাঁর বিরহিণী প্রিয়ার কাছে বার্তা পাঠাচ্ছেন। *রঘুবংশ* কাব্যে বর্ণিত হয়েছে রামের দিগ্বিজয় কাহিনী। সম্ভবত পরোক্ষভাবে গুপ্তদের কিছু রাজ্যজয়ের আভাস এতে আছে। শিব ও পার্বতীর প্রণয় ও পুত্র স্কন্দের জন্ম *কুমারসম্ভব* কাব্যের উপজীব্য। ভারতে দীর্ঘকাল ধরে প্রচারিত ত্যাগ ও তপস্যার আদর্শ প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির লেখনীতে এক অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। *ঋতুসংহার* কাব্যে বর্ণিত হয়েছে ষড়ঋতু ও তার সঙ্গে ছন্দ রেখে নর নারীর প্রেম। তাছাড়া এই কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতির প্রতি কবির সংবেদনশীল মন। শব্দ ও ছন্দের উৎকর্ষের বিচারে কালিদাসের কাব্য অতুলনীয় বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক *বিক্রমোর্বশী* গ্রন্থে একটি বৈদিক কাহিনী অবলম্বনে উপস্থাপিত হয়েছে নির্মমা উর্বশীর প্রতি পুরুরবার মত্ত প্রেমের কাহিনী। তবে কালিদাসের রচনায় উর্বশী রূপান্তরিত হয়েছেন সুখী অনুগত পত্নী রূপে। তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রচনা *অভিজ্ঞান শকুন্তলম* নাটকের বিষয় রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন। মহাভারতের বর্ণনার ওপরে ভিত্তি করে রচিত এই নাটকে মুক্ত শকুন্তলার শান্তশিষ্ট অনুগত নারীতে রূপান্তর তখনকার পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এই সাহিত্য নিদর্শনখানি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও নাট্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে বিবেচিত।

Scanned with CamScanner

গুপ্ত যুগে আরও কয়েকজন নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটেছিল। রাজবংশে জাত বলে কথিত শূদ্রক রচনা করেন *মৃচ্ছকটিক*। ধনী, রূপসী, গুণী ও পরিশীলিতা রাজনটী বসন্তসেনার প্রতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রেম এই নাটকের প্রধান উপজীব্য। বিশাখদত্ত রচনা করেন *মুদ্রারাক্ষস*; চাণক্যের সুচতুর পরিকল্পনা এর প্রধান বিষয়। তাঁর রচিত আরেকটি নাটক *দেবীচন্দ্রগুপ্তম* কেবল খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে।

শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারগণ তাদের সব থেকে সমৃদ্ধ এবং সৃজনশীল রচনার অবলম্বন প্রায়ই খুঁজে পেয়েছেন নারীর প্রতি পুরুষের দৈহিক কামনারঞ্জিত প্রেমে। সাহিত্যে নারী সৌন্দর্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার প্রতিরূপ দেখা যায় অজন্তার দেয়াল চিত্রে প্রদর্শিত কামোদ্দীপক নারী মূর্তির মধ্যে। গুপ্ত যুগ থেকে সাহিত্যের জগতে আদিরসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কামচর্চা বিষয়ে প্রথম সুসংবদ্ধ গ্রন্থ বাৎসায়নের *কামসূত্র*। এই বিষয়ে পরবর্তী লেখকদের আদর্শ রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই ধরনের রচনার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সামন্ত অভিজাত ও শাসকশ্রেণী। রাজসভার জীবন, তাঁর জাঁকজমক আর ঐশ্বর্য নিয়ে সংস্কৃত নাটক ও কাব্যে প্রতিফলিত। একমাত্র ব্যতিক্রম মৃচ্ছকটিক। শিল্পকলার মতো সংস্কৃত সাহিত্যও উপভোগ করতেন রাজসভা, উচ্চশ্রেণী এবং অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। এই কারণেই তখনকার নাটকের প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলি সমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্ত এবং তাঁদের সংলাপের ভাষা মার্জিত সংস্কৃত। অন্যদিকে নীচু শ্রেণীর মানুষ, নারী এবং ব্রাহ্মণ বিদূষকগণের সংলাপের ভাষা প্রাকৃত।

গুপ্ত যুগে ধর্মীয় সাহিত্য রচনা বৃদ্ধি পায়। এর প্রমাণ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকখানি পুরাণ (মার্কণ্ডেয়, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, ভাগবত এবং মৎস্য) এই যুগে সংকলিত হয়। পুরাণ প্রথম রচনা করেন চারণ কবির দল। দেখা যায় প্রতিটি পুরাণেরই কাহিনীকার সূত লোমহর্ষণ কিংবা তাঁর পুত্র উগ্রশ্রবা। কিন্তু গুপ্ত যুগে চারণ কবিদের রচনাগুলি এসে পড়ে ব্রাহ্মণ সংকলকদের হাতে; এরা প্রায়ই পুরাণগুলিতে আমদানি করতেন নতুন দেবতা কিংবা যোগ করতেন নতুন বেশ কিছু লেখা। ব্যাস রচিত বলে কথিত *মহাভারত*ও সংকলিত হয়। আদিতে এর শ্লোকসংখ্যা ছিল ২৪,০০০। এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১০০,০০০ শ্লোকে। মহাকাব্য ও স্মৃতিগ্রন্থগুলির বর্ণিত বিষয়গুলির কিছু কিছু এক। যেমন মনুর কিছু অনুশাসন মহাভারতের শান্তিপর্বে প্রায় একই আকারে দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় মনু গুপ্তযুগেও রচিত হতে পারে। বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন প্রভৃতি নামের রচয়িতাদের স্মৃতিগ্রন্থ সম্ভবত গুপ্ত যুগে রচিত। মহাকাব্য, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যে যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা 'পঞ্চতন্ত্রের' নীতিমূলক

Scanned with CamScanner

আখ্যানগুলিতেও পাওয়া যায়। কেবল সেগুলি গদ্যে লেখা, সঙ্গে আছে মাঝে মাঝে কিছু পদ্য।

গুপ্ত যুগে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়েও কিছু গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। *আর্যভটীয়* গ্রন্থের লেখক আর্যভট্ট খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে আবির্ভূত হন। প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন পৃথিবী তার কক্ষপথে আবর্তিত হয়, সূর্য পরিক্রমা করে এবং চন্দ্রের গায়ে ছায়া ফেলে গ্রহণের সৃষ্টি করে। এইসব ধারণা অবশ্য পরবর্তীকালের ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক চিন্তাকে তেমন প্রভাবিত করেনি; বিশ্বাসী জনগণ এর পরেও বিশ্বাস করতে থাকে যে রাহুর গ্রাসের ফলেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আর্যভট্টের প্রচেষ্টার ফলেই জ্যোতির্বিদ্যা গণিত থেকে স্বতন্ত্র এক বিদ্যা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তিনিই প্রথম দশমিকের অবস্থানগত মূল্য ব্যবহার করেন। তবে তিনি এই পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন এ-কথা মনে করা হয় না। ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে আবির্ভূত হন বরাহমিহির। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা ও কোষ্ঠীবিচার বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণাপুস্তক রচনা করেন। তাঁর *পঞ্চসিদ্ধান্তিকা* গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিদ্যার পাঁচটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে দুটি পদ্ধতি থেকে মনে হয় গ্রিক জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর লেখা *লঘু* ও *বৃহজ্জাতক* কোষ্ঠীবিচার সংক্রান্ত পুস্তক। গুপ্তযুগ থেকে পুস্তক দুটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অভিধান গ্রন্থ প্রণয়নের ফলে সংস্কৃত ভাষার সমৃদ্ধি ঘটে। অমরসিংহ সংকলিত *অমরকোষ* (*নামলিঙ্গানুশাসন* নামেও পরিচিত) আমাদের কাল পর্যন্ত একটি অপরিহার্য অভিধান হয়ে আছে।

ভারত-ইতিহাস বিষয়ে বেশিরভাগ মোটামুটি মানের বইগুলিতে গুপ্ত রাজগণের শাসনকালকে 'হিন্দু নবজাগরণের যুগ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই ধারণা আদৌ ঠিক নয়। গুপ্ত ভাস্কর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন সারনাথের বৌদ্ধ মূর্তিগুলি। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকলা অজন্তা চিত্রের বিষয়বস্তু বৌদ্ধ। আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের রচনায় জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতির যে পরিচয় পাওয়া যায় সেই অগ্রগতির মূলে ভারতীয় ঐতিহ্য ছিল আংশিক। বরাহমিহির কর্তৃক আলোচিত জ্যোতির্বিদ্যার পাঁচটি পদ্ধতির একটি হল *রোমক সিদ্ধান্ত*, যা স্পষ্টতই রোমান পদ্ধতি। আরেকটি পদ্ধতির নাম *পৌলিশসিদ্ধান্ত*। স্পষ্টতই আলেকজান্দ্রিয়ায় ধ্রুপদী জ্যোতির্বিদ পল-এর (Paul) নামের স্মারক। তথাকথিত হিন্দু নবজাগরণের তাহলে প্রধান উপাদান হল কালিদাসের রচনাবলি, কয়েকটি পুরাণ, মুদ্রা এবং লেখ যা ইঙ্গিত করে যে গুপ্ত রাজগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম, শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। কিন্তু কালিদাসের রচনাবলি মনীষার পুনর্জন্ম কিংবা সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপের পুনর্জাগরণের জোরালো নয়; বরং আরও প্রাচীনকালে যে সাহিত্যশৈলী আর আঙ্গিকের সৃষ্টি হয় ও বিকাশ

Scanned with CamScanner

চলে তার অগ্রগতির সূচক মাত্র। গুপ্ত আমলের বহু আগেই চারণ কবিদের পরিবেশিত সাহিত্যের আকারে পুরাণের অস্তিত্ব ছিল। গুপ্তযুগে কয়েকটি পুরাণের সংকলনের কাজ শেষ হয় এবং সেগুলিকে তাদের বর্তমান রূপ দেওয়া হয়। তেমনি শৈবধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির অর্থ কোনো ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন নয়। উল্লিখিত দুই ধর্মের মূল মতবাদের সূচনা প্রাচীনকালে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতির উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত দুটি ধর্মের অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 'হিন্দু' কথাটির ব্যবহার একইভাবে ভ্রান্তিজনক। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পারস্যের হখামনীয় রাজগণ সর্বপ্রথম হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করেন। পরে গুপ্তপরবর্তী যুগে আরবগণ হিন্দুর (ইন্ডিয়া) অধিবাসীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই শব্দটি ব্যবহার করেন। প্রাচীন ভারতীয়গণ নিজেদের কখনো হিন্দু ভাবতেন না। বহু প্রচারিত হিন্দু নবজাগরণ প্রকৃতপক্ষে নবজাগরণ নয়, হিন্দু নবজাগরণ তো দূরের কথা।

আভিজাত্যবর্জিত রামগুপ্তকে বাদ দিলে, গুপ্ত রাজগণকে জাতীয়তাবাদ পুনরুজ্জীবনের কৃতিত্ব দেওয়া হয়, সম্ভবত শক এবং হুনদের বিরুদ্ধে তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন বলে। টিকে আছে এমন রাজসভাকেন্দ্রিক কোনো নাটক কিংবা সংস্কৃত কাব্যে সরাসরি কোনো গুপ্তরাজার উল্লেখ নেই। সমসাময়িক সাহিত্যে উল্লেখ বলতে কেবল কয়েকটি পুরাণে তাঁদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাও আবার 'ম্লেচ্ছপ্রায়', অধার্মিক, অসৎ (অথবা মিথ্যাবাদী) কৃপণ এবং কোপনস্বভাব রূপে বর্ণিত ক্ষুদ্র রাজাদের সঙ্গে তাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। গুপ্ত রাজাদের ওপর প্রশংসা বর্ষিত হয়েছে কেবল তাদের নিজেদের লেখগুলিতে। এদের মধ্যে দীর্ঘতম প্রশস্তিটি সমুদ্রগুপ্তের। পতনের পরে গুপ্ত রাজগণও বহুসংখ্যক বিস্মৃতদের দলভুক্ত হন। তাঁদের লেখ-র পাঠোদ্ধার হওয়ার পরে মাত্র ঊনবিংশ শতকে আবার লোকে তাঁদের স্মরণে আনে। জাতীয়তাবাদী ভারতীয় পণ্ডিতগণ নথিপত্র হস্তগত করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অবিরাম প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁরা পাল্টা আক্রমণ চালাবার জন্য ওইসব নথিপত্র ব্যবহার করেন। ব্রিটিশ প্রচারের মূল কথা ছিল ভারতের ইতিহাস হল হানাদারের পর হানাদারদের দখলদারি। যথার্থ মন্তব্য করা হয়েছে ঃ 'গুপ্ত রাজগণ জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটাননি, বরং জাতীয়তাবাদই গুপ্তদের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিল।"

এক শ্রেণীর ভারতীয় ঐতিহাসিক গুপ্তদের প্রতি এতটাই মুগ্ধ যে ভারত-ইতিহাসে গুপ্তযুগকে স্বর্ণযুগ বলতে তাঁরা ক্লান্তিহীনভাবে সোচ্চার। আবেগে-ঠাসা, বহু খণ্ডে রচিত গ্রন্থে রোমান্টিক বিলাপের স্বরে বলা হয়েছে ঃ "এর চাইতে সুখী জীবন আর কখনো ছিল না।" কিন্তু এই সময়েই দেশের কয়েকটি অংশে ভূমিদাস প্রথা প্রথম দেখা যায়। তার ফলে কৃষক সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner

নারীরা এক ধরনের সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং চিরকালের জন্য পুরুষের অ
হয়ে পড়ে; তা শিল্প ও সাহিত্যে তাঁদের যতই আদর্শায়িত চিত্র অঙ্কন করা হো
কেন। আগের চাইতে জাতিগত ব্যবধান, জাতিভেদের কঠোরতা এই সময়ে
হয়ে ওঠে। আইন আর বিচার সব কিছুতেই দেখা যায় উচ্চবর্ণের লোকদের
পক্ষপাতিত্ব। ফা-হিয়েন বলেছেন এই সময়ে জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে সুখী
একথা সত্যি যে উচ্চশ্রেণীর মানুষ সুখী ও সচ্ছল ছিল এবং তারা আরামে
বাস করত; অন্তত সমকালীন শিল্প সাহিত্য থেকে এই ধারণাই জন্মে। কিন্তু নিম্নশ্রে
মানুষের জীবন সম্পর্কে এই ধারণা একেবারেই ঠিক নয়। চিনা পর্যটক
চণ্ডালদের দুরবস্থার কথা বলেছেন। সামাজিক বিন্যাসে সামগ্রিকভাবে অস্পৃশ্য
আরও অবনমন ঘটেছিল। সামাজিক সংঘাত অব্যাহত ছিল। কিন্তু বর্ণবিভক্ত সমা
টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছিল। উচ্চবর্ণের মানুষদের
ইতিহাসের সব যুগই স্বর্ণযুগ, আম জনতার জন্য কোনোটাই নয়। কিন্তু
সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ইতিহাসবিদগণ প্রায় সময়েই ইউটোপিয়ার সন্ধান করতে
অতীতমুখী হয়েছেন। স্বর্ণযুগের জন্য স্মৃতিকাতর এই আকাঙ্ক্ষাকে নিজের
ব্যবহার করতে ভারতের শাসকশ্রেণী কোনো সময়েই কসুর করেনি।

Scanned with CamScanner